بسم الله الرحمن الرحیم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ০২ জানুয়ারি, ২০২৬ মোতাবেক ০২ সুলাহ, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বিগত খুতবায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ সম্পর্কে কিছু কথা বর্ণিত হয়েছিল। বর্তমান যুগে মহানবী (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ দাসের কর্মে এবং নিজ মনিবের অনুসরণ ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আমরা সেই ঐশী প্রেমের প্রতিফলন দেখতে পাই। এই উদাহরণগুলো আজও বিদ্যমান। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার যে উচ্চমান রয়েছে এবং এর ফলে তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার যে অনুগ্রহরাজি বর্ষিত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা ছিল, তা অন্যরাও অনুভব করত। তবে অন্যান্য ঘটনাবলি বর্ণনা করার পূর্বে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের ভাষায় সেই ভালোবাসার উল্লেখ করছি। তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন:

"আমার মোটেও জানা নেই, আমার কোন কর্মের কারণে আমি খোদার এই অনুগ্রহ লাভ করেছি। আমি কেবল এটি অনুভব করি যে, প্রকৃতিগতভাবেই আমার হৃদয়ে মহান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বস্ততাপূর্ণ এক আকর্ষণ রয়েছে, যেটিকে কোনো কিছুই বাধা দিয়ে রাখতে পারে না। সুতরাং এটি কেবল তাঁরই অনুগ্রহ, যা মহান আল্লাহ্ আমার প্রতি করেছেন।"

যেমনটি আমি বিগত খুতবায় উল্লেখ করেছিলাম, তিনি (আ.) বহু স্থানে এটিও ব্যক্ত করেছেন যে, আমি এই সবকিছু এ কারণেই লাভ করেছি যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় নবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসারী এবং তাঁর একনিষ্ঠ প্রেমিক। আর এর ফলে আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার দ্বারসমূহও উন্মুক্ত হতে থাকে এবং আমার মাঝে এর উপলব্ধি সৃষ্টি হয়। অতঃপর মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহের বারিধারা আমার ওপর বর্ষিত হতে থাকে। তাঁর জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর হৃদয়ের এই অবস্থার কথা তুলে ধরে হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) এক স্থানে লেখেন: হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন,

المساجد مکانی والصالحون اخوانی وذکر اللہ مالی وخلق اللہ عیالی

অর্থাৎ "মসজিদ হলো আমার আবাসস্থল, পুণ্যবানরা আমার ভাই, আল্লাহ্র যিকর আমার সম্পদ এবং তাঁর সৃষ্টি হলো আমার পরিবার।"

অর্থাৎ, তিনি যা বর্ণনা করেছেন তার সবকিছুই মহান আল্লাহ্কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন: "আমরা প্রতিটি বস্তুকে কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ভালোবেসে থাকি। স্ত্রী হোক, সন্তান হোক কিংবা বন্ধুবান্ধব হোক– সবার সাথেই আমাদের সম্পর্ক কেবল আল্লাহ্র খাতিরে।" এটিই সেই শিক্ষা যা মহান আল্লাহ্ দান করেছেন এবং মহানবী (সা.) এই শিক্ষাই প্রচার করতে বলেছেন। আর এই যুগে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কর্মের মাধ্যমেই এর সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন:

“সত্যবাদীরা পরীক্ষার সময়েও অটল থাকেন এবং তারা জানেন, পরিশেষে আল্লাহ্ আমাদেরই সহায় হবেন। এই অধম যদিও এমন একনিষ্ঠ বন্ধুদের পেয়ে আল্লাহ্ তা’লার প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ঈমান রাখে যে, যদি একজন ব্যক্তিও সাথে না থাকে এবং সবাই আমাকে ফেলে রেখে যে যার মতো নিজের নিজের পথ ধরে, তবুও আমার কোনো ভয় নেই। আমি জানি, মহান আল্লাহ্ আমার সাথে আছেন। যদি আমাকে পিষে ফেলা হয়, পদপিষ্ট করা হয় এবং আমি একটি ধূলিকণার চেয়েও তুচ্ছ হয়ে যাই আর চতুর্দিক থেকে কষ্ট, গালি ও অভিসম্পাতের সম্মুখীন হই, তবুও পরিশেষে আমিই বিজয়ী হবো। আমাকে তিনি ছাড়া আর কেউ চেনে না যিনি আমার সাথে আছেন। আমি কখনোই ধ্বংস হতে পারি না। শত্রুদের চেষ্টা বৃথা এবং হিংসুকদের পরিকল্পনা নিষ্ফল। হে নির্বোধ ও অন্ধরা! আমার পূর্বে কোন সত্যবাদী ধ্বংস হয়েছে যে, আমি ধ্বংস হয়ে যাব? কোন প্রকৃত বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ অপমানের সাথে ধ্বংস করেছেন যে, আমাকে ধ্বংস করবেন? নিশ্চিতভাবে মনে রেখো এবং কান খুলে শুনে নাও– আমার আত্মা ধ্বংস হবার আত্মা নয় এবং আমার প্রকৃতিতে ব্যর্থতার কোনো উপকরণ নেই। আমাকে সেই সাহস ও নিষ্ঠা দান করা হয়েছে যার সামনে পাহাড়ও তুচ্ছ। আমি কারো পরোয়া করি না। আমি নিঃসঙ্গ ছিলাম এবং একাকী থাকায় অসন্তুষ্ট ছিলাম না। আল্লাহ্ কি আমাকে পরিত্যাগ করবেন? কখনোই নয়! তিনি কি আমাকে ধ্বংস করে দেবেন? কখনোই না! শত্রুরা লাঞ্ছিত হবে এবং হিংসুকরা লজ্জিত হবে, আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে প্রতিটি ময়দানে বিজয় দান করবেন। আমি তাঁর সাথে আছি এবং তিনি আমার সাথে আছেন; কোনো কিছুই আমাদের এই বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না। আমি তাঁর সম্মান ও প্রতাপের শপথ করে বলছি, ইহজগত ও পরকালে আমার কাছে এর চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই যে, তাঁর ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হোক, তাঁর মহিমা উদ্ভাসিত হোক এবং তাঁরই জয়জয়কার হোক। তাঁর অনুগ্রহে আমি কোনো পরীক্ষায় ভীত নই; একটি কেন, কোটি পরীক্ষাতেও নই। পরীক্ষার ময়দানে এবং দুঃখকষ্টের অরণ্যে আমাকে শক্তি দান করা হয়েছে।”

ফার্সী ভাষায় তিনি (আ.) একটি পঙ্‌ক্তিতে বলেন:

من نہ آنستم کہ روز جنگ بینی پشت من

آں منم کاندر میان خاک وخوں بینی سرے

অর্থাৎ “আমি এমন নই যে, যুদ্ধের দিন তুমি আমার পিঠ দেখবে; বরং আমি সেই ব্যক্তি যার মস্তক তুমি ধূলি ও রক্তের মাঝে দেখতে পাবে।”

তিনি (আ.) আমাদের বলেন, জামা’ তকে সম্বোধন করে বলেন, আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় এটিই আমার অবস্থা। অতএব যদি কেউ আমার সাথে চলতে না পারে, সে যেন আমার থেকে পৃথক হয়ে যায়। দুঃখকষ্ট তো আসবেই। আমি জানি না, সামনে আরো কত ভয়ানক অরণ্য এবং কন্টকাকীর্ণ উপত্যকা রয়েছে যা আমাকে অতিক্রম করতে হবে। অতঃপর তিনি বলেন:

“আমরা কি ভূমিকম্প দেখে ভয় পেতে পারি? আমরা কি মহান আল্লাহ্‌র পথে পরীক্ষায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ব? আমরা কি আমাদের প্রিয় খোদার কোনো পরীক্ষায় তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি? কখনোই পারি না!”

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, যেখানে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর ধর্মের খাতিরে কুরবানী করার ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.)-এর উদ্দীপনার উল্লেখ এসেছে; হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, মৌলভী সারওয়ার শাহ সাহেব আমাকে এই ঘটনাটি বলেছেন; যে দিনগুলোতে গুরুদাসপুরে করম দীনের সাথে মামলা চলছিল এবং ম্যাজিস্ট্রেট (পরবর্তী) তারিখ নির্ধারণ করে দিয়েছিল, তখন হুযূর (আ.) কাদিয়ানে অবস্থান করছিলেন। হুযূর (আ.) মামলার তারিখের দুই দিন আগে আমাকে গুরুদাসপুরে পাঠিয়েছিলেন যেন আমি সেখানে গিয়ে কিছু উদ্ধৃতি খুঁজে প্রস্তুত রাখি; কারণ পরবর্তী শুনানিতে সেই উদ্ধৃতিগুলো পেশ করার কথা ছিল। হুযূর (আ.) আমার সাথে শেখ হামিদ আলী সাহেব এবং আব্দুর রহীম বাবুর্চিকেও গুরুদাসপুরে পাঠিয়েছিলেন। যখন আমরা গুরুদাসপুরের বাসায় পৌঁছলাম, তখন নীচ থেকে মরহুম ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাইল খান সাহেবকে ডাক দিলাম। তিনি সেখানে ছিলেন। আমরা তাঁকে নীচে এসে দরজা খুলতে বললাম। ডাক্তার সাহেব তখন সেই বাসার ওপরতলায় অবস্থান করছিলেন। আমাদের ডাক শুনে ডাক্তার সাহেব অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে এবং চিৎকার করতে আরম্ভ করেন। আমরা বেশ কয়েকবার ডাকলাম, কিন্তু তিনি একইভাবে কাঁদতে থাকলেন। অবশেষে কিছুক্ষণ পর তিনি চোখ মুছতে মুছতে নীচে আসলেন। আমরা কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আমার কাছে মুনশি মুহাম্মদ হোসেন এসেছিল।' সেই ব্যক্তি আদালতে মুনশি হিসেবে কর্মরত ছিল এবং একজন অআহমদী ছিল। মৌলভী সাহেব বলেন, উক্ত মুহাম্মদ হোসেন গুরুদাসপুরের কোনো এক আদালতে মুহুরি বা পেশকারের কাজ করত এবং সে জামা'তের ঘোর বিরোধী ছিল। সে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর সাথে মেলামেশা রাখত।

যাহোক, ডাক্তার সাহেব নীচে এসে জানান, মুনশি মুহাম্মদ হোসেন এসেছিল এবং সে আমাকে বলেছে, 'সম্প্রতি এখানে আর্যদের জলসা হয়েছে। কিছু আর্য তাদের বন্ধুদেরও সেই জলসায় নিয়ে গিয়েছিল, সেই সূত্রে আমিও আমার এক আর্য বন্ধুর সাথে সেখানে গিয়েছিলাম। জলসার কার্যক্রম শেষ হবার পর কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে, জলসার কাজ শেষ হয়েছে, এখন সাধারণ মানুষ চলে যান, আমাদের একান্তে কিছু কথা আছে। ফলে বাইরের সব লোক উঠে যায়। আমিও চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার আর্য বন্ধুটি বলল, আমরা একসাথেই যাব, আপনি একপাশে গিয়ে বসুন অথবা বাইরে অপেক্ষা করুন। তাই আমি সেখানে একপাশে গিয়ে বসে পড়লাম।' মুহাম্মদ হোসেন সাহেব, যিনি অআহমদী ছিলেন– তিনি এটি বলছেন।

তারপর আর্যদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মির্যা সাহেবের নাম নিয়ে বলে, 'এই ব্যক্তি আমাদের ঘোর শত্রু এবং আমাদের নেতা লেখরামের হত্যাকারী। এখন সে আপনার শিকার এবং পুরো জাতির দৃষ্টি আপনার দিকে। আপনি যদি এই শিকারকে হাতছাড়া হতে দেন, তবে আপনি জাতির শত্রু হিসেবে গণ্য হবেন।' সেই ব্যক্তি এ ধরনের উত্তেজনামূলক কথা বলে। এতে ম্যাজিস্ট্রেট উত্তর দেয়, 'আমার তো আগে থেকেই ইচ্ছা রয়েছে যে, শুধু মির্যাকেই নয় বরং সম্ভব হলে এই মামলায় তার যত সঙ্গী ও সাক্ষী আছে– সবাইকে জাহান্নামে পৌঁছে দিই। কিন্তু কী আর করা যাবে! মামলাটি এমন বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা করা হচ্ছে যে, হাত দেবার মতো কোনো সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এখন আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যা-ই হোক না কেন, এই প্রথম শুনানিতেই আমি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

মৌলভী সাহেব বলতেন, ডাক্তার সাহেব বর্ণনা করছিলেন যে, মুহাম্মদ হোসেন তাঁকে বলছিল, 'আপনি হয়ত বুঝতে পারেন নি যে, আইনি ব্যবস্থা বলতে কী বোঝানো হয়েছে।

এর অর্থ হলো, প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেটের মামলার শুরুতে বা মামলা চলাকালে যেকোন সময় আসামিকে জামিন না দিয়ে গ্রেপ্তার করে হাজতে পাঠিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকে।' মুহাম্মদ হোসেন আরো বলে, 'ডাক্তার সাহেব, আপনি জানেন যে, আমি আপনাদের জামা'তের ঘোর বিরোধী।' [সে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন (বাটালভী)-এর অনুসারী ছিল, বিরোধী ছিল এবং নামও একই ছিল।] 'কিন্তু আমার বৈশিষ্ট হলো, আমি কোনো সম্মানিত পরিবারকে লাঞ্ছিত ও ধ্বংস হতে দেখতে পারি না, বিশেষ করে হিন্দুদের হাতে লাঞ্ছিত হতে দেখতে চাই না। আর আমি জানি, মির্যা সাহেবের পরিবার এই জেলায় সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। তাই আমি আপনাকে এই খবরটি পৌঁছে দিলাম যেন আপনারা এর কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন।' সে এরপর তার নিজের মতামতও ব্যক্ত করেছিল। সে বলে, আমার মতে দুটি উপায় আছে; একটি হলো, এখান থেকে মামলাটি চিফ কোর্টে স্থানান্তরের চেষ্টা করা। (সেই যুগে হাই কোর্টকে চিফ কোর্ট বলা হতো।) আর দ্বিতীয়টি হলো, যেমন করেই হোক, মির্যা সাহেব যেন আগামী শুনানিতে আদালতে উপস্থিত না হন এবং একটি ডাক্তারি সার্টিফিকেট পেশ করে দেন।'

মৌলভী সাহেব বর্ণনা করেন, ডাক্তার সাহেব যখন এই ঘটনা শোনান, তখন আমরা সবাই অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ি এবং সিদ্ধান্ত নিই, এখনই কোনো ব্যক্তিকে কাদিয়ানে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত যে হুযূর (আ.)-কে এই সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত জানাবে। রাত হয়ে গিয়েছিল, আমরা এক্কা গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়ি খুঁজলাম, অর্থাৎ বাহন সন্ধান করলাম। যদিও বেশ কিছু এক্কা সেখানে ছিল, কিন্তু বিরোধিতা এত তুঙ্গে ছিল যে, কোনো এক্কা পাওয়া যাচ্ছিল না, কোনো বাহন পাওয়া যাচ্ছিল না। কেউই যেতে রাজি হচ্ছিল না, সবাই অস্বীকার করছিল। আমরা চারগুণ ভাড়া দেবার কথা বললাম, কিন্তু কোনো এক্কাওয়ালা রাজি হয় নি। অবশেষে আমরা শেখ হামেদ আলী ও বাবুর্চি আব্দুর রহীম এবং তৃতীয় আরেকজনকে পদব্রজে কাদিয়ান প্রেরণ করি। তারা ফজরের নামাযের সময় কাদিয়ান পৌঁছেন এবং হযরত সাহেবের কাছে সংক্ষেপে (পুরো ঘটনা) খুলে বলেন। হুযূর (আ.) ভ্রুক্ষেপহীন অবস্থায় বলেন, ঠিক আছে, আমরা বাটালায় যাই। খাজা সাহেব এবং মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব লাহোর থেকে ফেরত আসার সময় আমাদের সঙ্গে সেখানেই দেখা করবেন। [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদেরকে বলেন, লাহোর থেকে খাজা সাহেব এবং মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব আসছেন, সেখানেই সাক্ষাৎ হবে।] আমরা সেখানে তাদের কাছে এসব কথা বলব, যা (তিনি) বলছিলেন। আর সেখানে জানা যাবে, মামলা স্থানান্তরের প্রচেষ্টার ফলাফল কী হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি আঁচ করতে পেরে আমাদের আইনজীবীরা আগেই মামলাটি অন্য কোনো আদালতে অর্থাৎ চিফ কোর্টে স্থানান্তরের আবেদন করে রেখেছিলেন।

তদনুসারে সেই দিনই হুযূর (আ.) বাটালায় চলে আসেন। গাড়িতে মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব এবং খাজা সাহেবের সাথেও দেখা হয়ে যায়। তারা জানান, মামলা স্থানান্তরের প্রচেষ্টা সফল হয় নি। [চিফ কোর্টে মামলাটি স্থানান্তরের যে আবেদন করা হয়েছিল সেটি গৃহীত হয় নি।] এরপর হযরত সাহেব গুরুদাসপুরে চলে আসেন আর পথিমধ্যে খাজা সাহেব এবং মৌলভী সাহেবকে এই বিষয়ে (অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেটের শত্রুতার বিষয়ে) কিছুই বলেন নি। [কী সংবাদ এসেছে– এ সম্পর্কে তিনি কোনো কথাই বলেন নি।] যখন তিনি (আ.) গুরুদাসপুরে সেই বাসায় পৌঁছেন যেখানে থাকার ব্যবস্থা ছিল, তখন নিজের অভ্যাস অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পৃথক কক্ষে গিয়ে খাটিয়ার ওপরে শুয়ে পড়েন। মৌলভী সাহেব বলেন, ঐ সময় (ম্যাজিস্ট্রেটের ষড়যন্ত্রের কথা ভেবে) আমাদের শরীরের লোম কাঁটা দিয়ে

ওঠে যে, এখন কী হবে? [কারণ ম্যাজিস্ট্রেট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।] হুযূর (আ.) কিছুক্ষণ পর মৌলভী সাহেবকে ডেকে পাঠান। তিনি বলেন, আমি গিয়ে দেখি, হযরত সাহেব উভয় হাতের তালু একত্র করে তাঁর মাথার নীচে দিয়ে রেখেছেন এবং চিত হয়ে শুয়ে আছেন। [সোজা হয়ে শুয়ে ছিলেন।] আমি যাবার পর তিনি (আ.) একদিকে কাত হয়ে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে নিজের হাতের তালুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন এবং আমাকে বলেন, আমি সেই পুরো ঘটনাটি শোনার জন্য আপনাকে ডেকেছি যে, বিষয়টি আসলে কী? সে-সময় কক্ষে আর কেউ ছিল না, দরজার পাশে শুধুমাত্র মিয়া শাদী খান দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি সম্পূর্ণ ঘটনা শুনালাম যে, কীভাবে আমরা এখানে এসে ডাক্তার ইসমাঈল খান সাহেবকে ক্রন্দনরত অবস্থায় পেলাম, ডাক্তার সাহেব মুনশি মুহাম্মদ হোসেনের আগমনের কথা বলেন আর অতঃপর মুহাম্মদ হোসেন কী ঘটনা বলেছিল– তা-ও বললাম। হুযূর (আ.) নীরবে শুনছিলেন। যখন আমি ‘শিকার’ শব্দে পৌঁছি– [অর্থাৎ সে যে বলেছিল, মির্যা সাহেব এখন আপনার শিকার–] তখন হঠাৎ হযরত সাহেব উঠে বসেন, তাঁর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে এবং মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে যায় আর তিনি (আ.) বলেন, **‘আমি তার শিকার? আমি শিকার নই; আমি সিংহ, তা-ও আবার খোদার সিংহ! সে খোদার সিংহের ওপর হাত দেবার দুঃসাহস করতে পারে কি? এমনটি করে তো দেখুক!’** এই বাক্য বলার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর এত উঁচু ছিল যে, কক্ষের বাইরের লোকজনও চমকে ওঠে এবং বিস্ময়ের সঙ্গে (এদিকে) মনোযোগ নিবদ্ধ করে, কিন্তু কেউই কক্ষের ভেতরে আসে নি। হুযূর (আ.) কয়েকবার **‘খোদার সিংহ’** শব্দটি পুনরাবৃত্তি করেন। আর সেসময় তাঁর চোখ দুটি যা সবসময় অবনত ও অর্ধ-নিমীলিত থাকত– সত্যিকার অর্থেই সিংহের চোখের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল এবং চেহারা এতটাই রক্তিম ছিল যে, (সেদিকে) তাকানো যাচ্ছিল না। এরপর তিনি (আ.) বলেন, “আমি কী করব? আমি তো আল্লাহ্‌র সমীপে (বিষয়টি) উপস্থাপন করেছি যে, আমি তোমার ধর্মের খাতিরে লোহার হাতকড়া ও বেড়ি পরতেও প্রস্তুত আছি। [অর্থাৎ আমাকে হাতকড়া পরালেও আমার কিছু যায় আসে না, শিকল পরতেও প্রস্তুত আছি, কিছুই হবে না; বরং এতে আমার কিছুই যায় আসে না।] কিন্তু তিনি বলেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, ‘না! আমি তোমাকে লাঞ্ছিত হবার হাত থেকে রক্ষা করব এবং সসম্মানে মুক্তি দেবো’।” অতঃপর তিনি (আ.) ঐশীপ্রেম সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন এবং প্রায় আধা ঘণ্টা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় পরম আবেগের সাথে বলতে থাকেন।

আল্লাহ্ তা’লার সাথে প্রেম-ভালোবাসায় আত্মত্যাগের এক বিস্ময়কার দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ তা’লার সত্তার প্রতি তাঁর কত অগাধ আস্থা ছিল! আর এই আস্থা ছিল মূলত খোদাপ্রেমেরই প্রতিফলন। আর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যেহেতু আমি আল্লাহ্ তা’লাকে ভালোবাসি এবং তাঁর খাতিরে যে-কোনো কুরবানীর জন্য প্রস্তুত আছি, তাই আল্লাহ্ তা’লা আমাকে কখনো ধ্বংস করবেন না।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা রয়েছে। একবার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ক্যাপ্টেন লেমারচান্দ (Captain Lemarchand) লেখরাম হত্যার সন্দেহে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে হঠাৎ কাদিয়ানে উপস্থিত হয় এবং হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.) এই সংবাদ পান। তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যান। তিনি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে কোনোমতে নিবেদন করেন, (পুলিশ) সুপারিনটেনডেন্ট গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও হাতকড়া নিয়ে আসছে। হযরত আকদাস (আ.) তখন তাঁর পুস্তক ‘নূরুল

কুরআন’ রচনা করছিলেন। তিনি প্রশান্তচিত্তে মাথা তুলে হাসিমুখে বলেন, **‘মীর সাহেব! মানুষ তো আনন্দের সময় সোনা-রূপার কঙ্কণ বা চুড়ি পরে থাকে; আমরা না হয় মনে করব, আমরা আল্লাহ্ তা’লার পথে লোহার কঙ্কণ পরেছি।’**

এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বলেন, **‘তবে এমনটি হবে না, কারণ ঐশী রাজত্বের নিজস্ব নিয়মনীতি আছে; তিনি তাঁর খলীফা ও প্রেরিতদের এভাবে লাঞ্ছিত করেন না।’** বাস্তবে তা-ই হয়েছিল এবং তারা (তথা পুলিশ) সফল হতে পারে নি।

একইভাবে মৌলভী আব্দুল করীম শিয়ালকোটি সাহেব (রা.) একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, একবার হুযূর (আ.) জলন্ধরে অবস্থানকালে বলেছিলেন, পরীক্ষার সময় জামা’তের কিছু দুর্বলচিত্ত লোকদের নিয়ে আমার আশঙ্কা হয়। [জামা’তের দুর্বল হৃদয়ের মানুষদের ব্যাপারে চিন্তা হয়। অর্থাৎ পরীক্ষা তো আসেই, মামলা-মোকদ্দমা হয় এবং বিরোধিতাও হতো, তাঁরও হয়েছে এবং তাঁর জামা’তের সদস্যদেরও হয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি (আ.) বলেছেন, আমাদের চিন্তা হয় কেবল জামা’তের সেসব দুর্বলচিত্তের মানুষদের নিয়ে, কোনো কোনো দুর্বল ঈমানের লোকদের জন্য হয়ে থাকে।] এরপর তিনি (আ.) বলেন, “আমার অবস্থা তো এমন যে, আমি যদি পরিষ্কারভাবে এই শব্দও শুনতে পাই যে, ‘তুই প্রত্যাখ্যাত এবং তোর কোনো মনোবাসনা আমরা পূর্ণ করব না’– তবে আল্লাহ্‌র কসম! এই ঐশীপ্রেম, ভালোবাসা এবং ধর্মসেবায় আমার বিন্দুমাত্র কমতি হবে না। তখনও আমি আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করব না, ভালোবাসাও কমবে না। কারণ আমি তো তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি। আল্লাহ্ তা’লার প্রতি আমার আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। যা-ই হোক না কেন– আমার ভালোবাসা বা আন্তরিকতায় কোনো ঘাটতি দেখা দেবে না।”

অনুরূপভাবে হযরত নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবা (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পরম প্রিয় সত্তা আল্লাহ্‌র প্রতি যে প্রেম লালন করতেন, যা তাঁর আত্মা ও দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ছিল, তা তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে সবসময় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত। আমি নামাযের সময় ছাড়াও তাঁকে (আ.) নিজের পরম দয়ালু প্রভুকে অত্যন্ত আকুল হয়ে ডাকতে শুনেছি। [শুধু নামাযের সময়েই নয়, বরং সাধারণ অবস্থায়ও অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে আল্লাহ্‌কে ডাকতে শুনেছি।] আর তিনি (আ.) কী বলতেন? ‘হে আমার প্রিয় আল্লাহ্! হে আমার প্রিয় আল্লাহ্, হে আমার প্রিয় আল্লাহ্’। এমন (দরদভরা) কণ্ঠে ডাকতেন যে, [তিনি বলেন,] মনে হয় সেই আওয়াজ আমি এখনো শুনছি, আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আর আমি যেন তাঁর অশ্রুধারা প্রত্যক্ষ করেছি। [সেই দৃশ্যটি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। তিনি সেই সময়ের একটি চিত্র অংকন করেছিলেন।] তাঁর সেই চিরন্তন ও প্রিয় আল্লাহ্‌র জন্য আত্মাভিমানের একটি চোখে দেখা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে তিনি (রা.) বলেন, ‘এটি তো ছিল দোয়ার অবস্থা, যা আমি দেখেছিলাম। তবে আরেকটি ঘটনাও উল্লেখ করছি। তিনি (আ.) নিজের কক্ষে ছিলেন এবং বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কোথাও যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাছেই ছিলাম। (এমন সময়) আমাদের জেঠি সাহেবার ব্যক্তিগত সেবিকা, যিনি জেঠি সাহেবার প্রায় কাছাকাছি সময়েই বয়আত করেছিলেন এবং বেহেশতী মাকবেরায় সমাহিত আছেন, (তিনি) হযরত আম্মাজানের কাছে আসেন। আত্মীয়তার খাতিরে তিনি তার কাছে আমাদের চাচা মির্যা ইমাম উদ্দীনের মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ করেন। সে যখন পাঞ্জাবীতে এই কথাটি বলছিল যে, ‘সে কত ভালো মানুষ ছিল!’ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাইরে বের হন। তাঁর পবিত্র চেহারা রক্তিম হয়ে উঠে। তিনি তাঁর লাঠি মাটিতে আঘাত করে বলেন, **“হতভাগী! তুই আমার ঘরে বসে আমার খোদার**

শত্রুর প্রশংসা করছিস? মির্যা ইমাম উদ্দীন সাহেব ইসলামবিমুখ ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লাকে নিয়ে উপহাস করত।" তাঁর (আ.) আত্মাভিমান এটা সহ্য করতে পারে নি যে, তাঁর ঘরে বসে এমন একজনের আলোচনা করা হবে। নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবা (রা.) লেখেন, তাঁর কণ্ঠে এমন প্রতাপ ছিল যে, সেই মহিলা সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। মির্যা ইমাম উদ্দীন সাহেব ছিল নাস্তিক, আর তাঁর (আ.) ঘরে এমন একজন নাস্তিকের এত প্রশংসা করা তার জন্য সহ্য করা ছিল অসম্ভব।

তিনি (রা.) শৈশব ও যৌবনকাল থেকেই তাঁর মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় সময় অতিবাহিত করেছেন। একটি রেওয়ায়েতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, একজন শিখ জমিদারের বিবৃতি, যিনি আমাদের দাদার পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য চাকরির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। একবার একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা প্রভাবশালী ব্যক্তি আমাদের দাদাকে জিজ্ঞেস করেন, "শুনেছি আপনার একটি ছোটো ছেলেও আছে, কিন্তু তাকে আমরা কখনো দেখি নি।" দাদাজান [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতা] মুচকি হেসে বলেন, "হ্যাঁ, আমার একটি ছোটো ছেলে আছে বটে, কিন্তু নববধূর মতো তাকে খুব কমই দেখা যায়। যদি তাকে দেখতে চাও, তবে মসজিদের কোনো কোণে গিয়ে দেখো। সে তো মুসীতাড় (অর্থাৎ মসজিদেই পড়ে থাকে)।"

এই রেওয়ায়েতটি মিরাজ দ্বীন উমর সাহেব আরো বিশদভাবে লিখেছেন। তিনি (হুযূরের পিতা) বলেন, মসজিদের অযুখানার কলের কাছে গিয়ে খোঁজো। সেখানে না পেলে হতাশ হয়ে ফিরে এসো না। মসজিদের ভেতরে চলে যেও এবং সেখানে কোনো এক কোণে খুঁজে দেখো। সেখানেও না পেলে নিরাশ হয়ে ফিরে যেও না। কোনো নামাযের চাটাইয়ে দেখো, হয়ত কেউ তাকে চাটাই দিয়ে পেঁচিয়ে একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে। কারণ সে তো জীবিত থেকেও মৃত। তাঁর ফানাফিল্লাহ্ (আল্লাহ্তে বিলীন) অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কেউ যদি তাঁকে চাটাই দিয়ে পেঁচিয়েও ফেলে, তবুও সে প্রতিবাদ করবে না, টেরও পাবে না।

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরো একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন, আমার কাছে হাজী আব্দুল মজীদ সাহেব লুধিয়ানভী বর্ণনা করেছেন, একবার হুযূর (আ.) লুধিয়ানায় অবস্থান করছিলেন। আমার বাড়িতে একটি নিমগাছ ছিল। যেহেতু বর্ষাকাল ছিল, তাই গাছের পাতাগুলো অত্যন্ত সতেজ ও সবুজ লাগছিল। হুযূর (আ.) আমাকে বলেন, 'হাজী সাহেব, এই গাছের পাতাগুলোর প্রতি লক্ষ করুন! কত সুন্দর লাগছে।' হাজী সাহেব বলেন, সেই সময়ে আমি লক্ষ করি যে, তাঁর চোখ অশ্রুতে পরিপূর্ণ ছিল। আল্লাহ্ তা'লার মহিমা এবং তাঁর ভালোবাসা তাঁর মনে জেগে উঠেছিল, আর সে কারণেই ঐ সময় তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়েছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, 'এখানে এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পরে খুবই নিষ্ঠাবান আহমদী হয়েছিলে এবং হযরত সাহেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু আহমদী হবার পূর্বে হযরত সাহেব তাঁর প্রতি বিশ বছর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এর কারণ ছিল, হযরত সাহেব তার একটি কথায় চরম অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বিষয়টি এমন ছিল যে, তার এক ছেলে মারা গিয়েছিল। হযরত সাহেব নিজ ভাইয়ের সাথে তাদের কাছে শোক প্রকাশ করতে গেলেন, সমবেদনা জানাতে গেলেন। তাদের রীতি ছিল, ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধু আসলে তাকে আলিঙ্গন করে কান্না করত এবং চিৎকার করত। সে অনুযায়ী তিনি হযরত সাহেবের

বড়ো ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আল্লাহ্ আমার প্রতি ভীষণ অন্যায় করেছেন! এটি শুনে হযরত সাহেবের এত বিতৃষ্ণা হলো যে, তিনি তার চেহারাও দেখা পছন্দ করতেন না। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তিকে সুযোগ দেন এবং তিনি এসব অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ থেকে বিরত হন।

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরেকটি রেওয়ায়েত করেন, কপুরথলা নিবাসী মুনশি জাফর আহমদ লিখিতভাবে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাথাঘোরা রোগ ছিল। একজন চিকিৎসক সম্পর্কে জানা যায়, তিনি এই বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা রাখেন, এই রোগের চিকিৎসা করেন। তাকে যাতায়াত ভাড়া দিয়ে দূর থেকে ডেকে আনা হয়। তিনি হুযূরকে (আ.) দেখে বলেন, দুইদিনে আমি আপনার স্বাস্থ্য বহাল করে দেবো, আমি আপনাকে ঠিক করে দেবো। এটি শুনে হযরত সাহেব বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন এবং হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবকে চিরকুট পাঠালেন, আমি কোনোভাবেই এই ব্যক্তির কাছ থেকে চিকিৎসা করাতে চাই না। সে কি ঈশ্বরত্বের দাবি করে? তাকে ফেরত যাত্রার ভাড়া এবং অতিরিক্ত পঁচিশ টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিন। অর্থাৎ নিজের কাছ থেকে পাঠিয়ে বলেন, এটি তাকে দিয়ে দিন এবং তাকে বিদায় করে দিন। এমনটাই করা হলো। তিনি বলেন, সে বলছে– আমি ঠিক করে দেবো! আল্লাহ্ তা'লা ব্যতীত আর কে ঠিক করতে পারে? আসল আরোগ্যদাতা হলেন আল্লাহ্ তা'লা।

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) কপুরথলা নিবাসী মুনশি জাফর আহমদ সাহেবের বরাতে আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। মরহুম চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেব রেলওয়ের ইন্সপেক্টর ছিলেন। মাসিক একশ পঞ্চাশ টাকা পেতেন। খুবই নিষ্ঠাবান ও জামা'তের মাঝে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মাসিক বিশ টাকা নিজের কাছে রেখে বেতনের পুরো টাকা হযরত সাহেবকে পাঠিয়ে দিতেন। এটি তাঁর স্থায়ী রীতি ছিল। তার শুধু একজন পুত্র ছিল। সে অসুস্থ হলে সস্ত্রীক তাকে নিয়ে কাদিয়ান চলে আসেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গৃহে অবস্থান করেন। হযরত আকদাস একদিন বলেন, আমি রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমার আল্লাহ্কে কেউ গালি দিচ্ছে। আমি এতে ভীষণ ব্যথিত হই। যেদিন তিনি (আ.) এই স্বপ্নের উল্লেখ করেন, এর পরদিন চৌধুরী সাহেবের পুত্র মারা যায়। যেহেতু একমাত্র পুত্রসন্তান ছিল, তার মা অনেক আহাজারি করে এবং এই অবস্থায় তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে, 'হে যালিম! তুমি আমার প্রতি অনেক অন্যায় করেছ।' আল্লাহ্কে সম্বোধন করে তিনি এ কথা বলেন। এমন শব্দ কয়েকবার তিনি বলেন যা হযরত সাহেব শুনতে পান। সে সময় তিনি (আ.) বাহিরে আসেন। তাঁকে খুবই ব্যথিত মনে হচ্ছিল। অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় তিনি বলেন, এই মুহূর্তে এই মহিলা আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাক! ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের মা খুবই বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি চৌধুরী সাহেবের স্ত্রীকে বুঝালেন এবং বললেন, হযরত সাহেব ভীষণ রাগান্বিত। সেই মহিলা তওবা করেন, ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বলেন, এখন থেকে আমি কান্নাকাটিও বন্ধ করলাম। মীর সাহেবের মা হযরত সাহেবের কাছে এসে উল্লেখ করে বলেন, এখন ক্ষমা করে দিন। সে তওবা করছে এবং কান্নাকাটি বন্ধ করেছে। হযরত সাহেব বলেন, ঠিক আছে, তাকে থাকতে দাও এবং ছেলেটার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করো।

শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, তাঁর ভাষাতেই ইরফানী সাহেব লিখেছেন, যখনই মাঝে মাঝে ডালহৌজি যাবার সুযোগ হয়েছে, পাহাড়ের

সবুজ-শ্যামল প্রান্তর এবং প্রবাহমান পানি দেখে হৃদয়ে অবলীলায় আল্লাহ্ তা'লার গুণকীর্তনের স্পৃহা সৃষ্টি হতো, ইবাদতে এক স্বাদ আসত। আমার অভিজ্ঞতা হলো, নির্জন সময় কাটানোর সেখানে উত্তম সুযোগ রয়েছে।

অনুরূপভাবে সেই স্বাদ ও প্রেম-ভালোবাসার উল্লেখ করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, ঐশী ভালোবাসার এক পরম স্বাদ তাদের হৃদয়ে গেঁথে দেওয়া হয় যারা মিলনের স্বাদে সিঞ্চিত হয়েছে। যদি তাদের সত্তাকে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে যারা ভালোবাসে তাদের সত্তাকে যদি বিপদাবলির হামান-দিস্তায় পিষা হয় আর কঠিন জাঁতাকলে ফেলে নিঙড়ানো হয়, তবে ঐশী প্রেম ছাড়া তাদের অন্য কোনো নির্যাস খুঁজে পাওয়া না।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে যারা ভালোবাসে তাদের হৃদয়ে এমন ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তাদেরকে যদি হামান-দিস্তায় ফেলে পিষা হয়, বা পিষে ফেলার যন্ত্র অথবা গ্রাইন্ডার মেশিনে রেখে পিষে দেওয়া হয় অথবা কোনো ভাঙন যন্ত্রে ফেলে তার রস নিঙড়ানো হয়, তাতে ঐশী ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হবে না।

অন্য আরেকটি বর্ণনায় মালেক মওলা বখশ সাহেবের বরাতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মরহুম সাহেবযাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেব যখন অসুস্থ ছিলেন তাকে নিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দুঃশ্চিন্তা ও উদ্‌বেগের কথা কানে আসত। যখন সাহেবযাদা সাহেব মৃত্যুবরণ করেন তখন সরদার ফযল হক সাহেব এবং ডাক্তার ইবাদুল্লাহ্ সাহেব মরহুম এবং এই অধম সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য কাদিয়ানে আসেন। কিন্তু যখন হুযূর (আ.) মসজিদে আগমন করলেন তখন হুযূর (আ.)-কে পূর্বের ন্যায়, বরং তার চেয়ে অধিক আনন্দিত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সাহেবযাদা মরহুমের মৃত্যুর বিষয়ে যখন উল্লেখ করা হলো তখন হুযূর (আ.) বললেন, মুবারক আহমদ মারা গেছে, আমার প্রভুর কথা পূর্ণ হয়েছে। তিনি তো পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন, এই পুত্র হয় দ্রুত মারা যাবে, নতুবা অনেক বড়ো খোদাপ্রেমী হবে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা তাকে ডেকে নিয়েছেন। একজন মুবারক আহমদ কেন, যদি হাজার পুত্র হয় আর সবাই মারা যায় আর তাতে যদি আমার আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন, তাঁর বাণী পূর্ণতা পায়– তাতেই আমার আনন্দ। এই অবস্থা দেখে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়েও আমাদের মাঝে কারো সমবেদনা জ্ঞাপনের সাহস হয় নি।

হযরত নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবা (রা.) লেখেন, আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তায় তাঁর সত্যিকারের ভালোবাসা সর্বদা দৃষ্টিগোচর হতো। আমি একবার তাকে দোয়া করতে ও কাঁদতে দেখি। খুব বেদনাভরা হৃদয়ে তিনি নিজ প্রিয় প্রভু ও প্রেমাস্পদকে ডাকছিলেন আর বার বার বলছিলেন, হে আমার প্রিয় প্রভু! হে আমার প্রিয় প্রভু! আমি এটি স্বয়ং দেখেছি। তিনি (আ.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রেমিক ছিলেন, সুমহান প্রভুর প্রেমিক ছিলেন। তাঁর চেহারায় সেই ভালোবাসার জ্যোতি ছিল, তাঁর মুখে সেই জ্যোতি বহমান ছিল, তাঁর কথায় সেই জ্যোতির ঝরনাধারা প্রবাহিত হতো। কিন্তু অন্ধরা তা দেখতে পায় নি।

লুধিয়ানার প্রখ্যাত সুফি বুযুর্গ হযরত মুনশি আহমদ জান সাহেব যখন হজ্জে যাচ্ছিলেন তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হজ্জে যাবার পূর্বে তাকে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি লেখেন, "এই অযোগ্য-অধমের এক বিনীত নিবেদন স্মরণ রাখবেন। যখন আল্লাহ্‌র কৃপায় আপনার বাইতুল্লাহ্ যিয়ারত করার সুযোগ হবে তখন সেই পবিত্র আশিসময় স্থানে আল্লাহ্‌র এই অধম বান্দার পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত শব্দে একান্ত বিনয় ও দীনতার সাথে এবং বিগলিত চিত্তে নিবেদন করবেন, **'হে পরম করুণাময়! তোমার এক অসহায় ও অকর্মণ্য, পাপী ও**

অযোগ্য বান্দা গোলাম আহমদ, যে তোমার পৃথিবীর হিন্দুস্থানে অবস্থান করছে, তার পক্ষ থেকে এই নিবেদন– হে পরম করুণাময়! তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং আমার সমস্ত ভুলত্রুটি ও পাপসমূহ ক্ষমা করো, কেননা তুমি অতীব ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী। আর আমার দ্বারা সেই কাজ সম্পন্ন করাও যাতে তুমি খুবই সন্তুষ্ট হও। আমার ও আমার প্রবৃত্তির মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের ন্যায় দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, আর আমার জীবন, আমার মৃত্যু ও আমার সমস্ত শক্তি যা আমাকে দান করা হয়েছে– সবই তোমার পথে নিয়োজিত করো এবং তোমারই ভালোবাসায় আমাকে জীবিত রাখো, তোমারই ভালোবাসায় আমাকে মৃত্যু দাও এবং তোমারই পরিপূর্ণ প্রেমিকরূপে পুনরুত্থিত করো। হে পরম করুণাময়! যে কর্ম সম্পাদনের জন্য তুমি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছ আর যে কর্মযজ্ঞের জন্য তুমি আমার অন্তরে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছ– তোমার অনুগ্রহে তা পরিপূর্ণ করে দাও এবং অধমের মাধ্যমে ইসলাম-বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে ও সেই সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে যারা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ– ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করাও। এই অধম, নিষ্ঠাবান অনুসারী এবং সমমনাদেরকে ক্ষমা এবং দয়ার নিরাপত্তায় রেখে ইহকাল ও পরকালে তাদের অভিভাবক হয়ে যাও আর সবাইকে তোমার সন্তুষ্টির নিবাসে পৌঁছাও এবং মহানবী (সা.)-এর পরিবার ও সাথিদের প্রতি অধিক পরিমাণে শান্তি ও কল্যাণ অবতীর্ণ করো।’

আমি এই সুদীর্ঘ দোয়ার কিছু অংশ পাঠ করেছি, সম্ভবত মাঝে আরো কিছু শব্দ বাদ পড়ে থাকবে। যাহোক, হযরত মুনশি সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী তার দলের সাথে সেই বছর বড়ো হজ্জের সময় বায়তুল্লাহ্ শরীফ ও আরাফাতের মাঠে এই দোয়া করেছেন। আমরা লক্ষ করি, তাঁর (আ.) এই দোয়ার প্রতিটি শব্দ অসাধারণভাবে আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় রঙিন ছিল। এক আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার মহান বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রতিটি শব্দ থেকে উৎসারিত হতে দেখা যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি বলছি, আমাকে যদি এ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে, আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার কারণে এবং তাঁর আনুগত্যের কারণে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দেওয়া হবে– তবুও আমি শপথ করে বলছি, আমার প্রকৃতিই এমন, তা এসব দুঃখকষ্ট ও বিপদকে আনন্দ ও ভালোবাসার উচ্ছ্বাস নিয়ে সাগ্রহে সহ্য করতে প্রস্তুত থাকবে। আর এমন নিশ্চিত শাস্তি ও কষ্ট সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য ও অনুসরণ থেকে এক পা-ও সরে দাঁড়ানোকে হাজার নয়, বরং সীমাহীন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর ও বিপদাবলির সমষ্টি মনে করে।

অতঃপর আরো বলেন, কত হতভাগা সে ব্যক্তি যে আজও জানে না– তার এরূপ এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান! আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ। কেননা আমি তাঁকে দর্শন করেছি এবং তাঁকে সকল সৌন্দর্যের আধার হিসেবে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়ে হলেও এই সম্পদ হস্তগত করার যোগ্য। প্রাণের বিনিময়েও যদি এই মণি ক্রয় করতে হয় তবে তা করা উচিত। হে (খোদা লাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! তোমরা এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদের সিঞ্চিত করবে। এটি জীবনের উৎস, এটি তোমাদেরকে রক্ষা করবে। আমি কি করব এবং কী উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেবো? মানুষের শ্রুতিগোচর করার জন্য কোন জয়ঢাক দিয়ে আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করব, ‘ইনি তোমাদের খোদা’। কোন ঔষধ আমি প্রয়োগ করব যেন শ্রবণের জন্য তাদের কর্ণ উন্মুক্ত হয়? ঐদি তোমরা খোদার হয়ে যাও তবে

নিশ্চিত হতে পারো যে, খোদা তোমাদেরই। তোমরা নিদ্রাভিভূত থাকবে এবং খোদা তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকবেন। তোমরা শত্রুর বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকবে, কিন্তু খোদা তার ওপর দৃষ্টি রাখবেন এবং তার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেবেন। তোমরা এখনো অবগত নও যে, তোমাদের খোদা কী কী শক্তির অধিকারী। যদি তোমরা অবগত হতে তবে দিনেকের তরেও এই সংসারের জন্য চিন্তিত হতে না। যে ব্যক্তির নিকট একটি ধনভাণ্ডার রয়েছে, সে কি কখনো একটি পয়সা নষ্ট হলে সেজন্য বিলাপ বা চিৎকার করে মরে? সুতরাং তোমরা যদি এই ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকতে যে, খোদা তোমাদের প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় কাজে আসবেন, তবে সংসারের জন্য তোমরা এরূপ আত্মহারা হতে না। খোদা এক প্রিয় সম্পদ, তোমরা তাঁর সমাদর করো। প্রত্যেক পদে তিনিই তোমাদের সহায়ক। তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে তোমরা কিছুই নও এবং তোমাদের পার্থিব উপকরণ ও প্রচেষ্টা কিছুই নয়।

এরপর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিমায় তিনি (আ.) বলেন, হে আমার খোদা! আমার মওলা! আমার প্রিয় মালিক! আমার প্রিয়! আমার প্রেমাস্পদ! (এরপর তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন,) জগৎ আমাকে বলে, তুই কাফির! কিন্তু তোমার চেয়ে প্রিয় অন্য কাউকে কি আমি পাব যার খাতিরে তোমাকে পরিত্যাগ করব? কিন্তু আমি দেখছি, মানুষ যখন ঔদাসীন্যের ঘোরে থাকে, যখন আমার বন্ধুবর্গ এবং শত্রুদেরও কোনো খবরই থাকে না যে, আমি কী অবস্থায় আছি– তখন তুমি আমাকে জাগ্রত করো আর আমাকে স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে বলো যে, 'ব্যথিত হয়ো না, আমি তোমার সাথে আছি।' হে আমার প্রভু! এটি তাহলে কীভাবে সম্ভব, এই অনুগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব? কখনও নয়! কখনও নয়! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি সেই নিদর্শনাবলি গণনা করতে পারব না যেগুলো সম্পর্কে আমি অবহিত। আমি তোমাকে জানি যে, তুমিই আমার খোদা। [তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করে এটি বলেন।] এজন্য আমার আত্মা তোমার নামে এমনভাবে উচ্ছ্বসিত হয় যেভাবে দুগ্ধপোষ্য শিশু নিজ মাকে দেখে উচ্ছ্বাস বোধ করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আমাকে শনাক্ত করতে পারে নি এবং কবুল করে নি।

অতএব, এ ছিল ঐশী প্রেম ও আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা যা তাঁর মনিবের অনুসরণের ফলে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাঝে আল্লাহ্‌র জন্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এ বিষয়ে তিনি (আ.) তাঁর জামা'তকেও সম্বোধন করে নসীহত করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাক। যখন তোমরা আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে কুরবানী করবে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবে, তাঁর প্রাপ্য প্রদান করবে, তখন আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদের সকল শত্রু থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন, সকল দুঃখকষ্ট থেকে তোমাদের দূরে রাখবেন। আর তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে কাজই করবে, এর প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের অগণিত দানে ভূষিত করবেন– ইহকালেও এবং পরকালেও। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর এরূপ প্রেমাস্পদ ও প্রেমিকে পরিণত করুন।

যেমনটি সবাই জানেন, গতকাল থেকে নতুন বছর শুরু হয়েছে। সবাই একে অপরকে নববর্ষের শুভেচ্ছাও জানাচ্ছে। দোয়া করুন, এ বছরটি যেন আমাদের জন্য অগণিত কল্যাণ বয়ে আনে। আল্লাহ্ তা'লা বিরোধীদের ও শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ধূলিস্মাৎ করে দিন এবং জামা'তকে পূর্বের তুলনায় অধিক উন্নতি দান করুন। আমরা যারা বহির্বিশ্বে আছি, বিশেষ করে ধর্মীয়ভাবে স্বাধীন এসব দেশে স্বাধীনভাবে বসবাস করছি এবং নতুন বছরের আনন্দ উদযাপন করছি, এমনকি পাকিস্তান প্রভৃতি দেশেও মানুষ নববর্ষ উদযাপন করছে; এমন

আনন্দের মুহূর্তে নিজেদের কারাবন্দি ভাইদেরও দোয়ায় স্মরণ রাখুন। কিছুদিন আগে আমি মুবারক সানী সাহেবের কথা বলেছিলাম যাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তিনি ছাড়াও অন্য অনেক আহমদী পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি অবস্থায় আছেন। এমতাবস্থায়ও তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নতুন বছরে প্রবেশ করছেন। তাদের কোনো অভিযোগ-অনুযোগ নাই। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে তারা লোহার বেড়ি পরিধান করে আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের দ্রুত মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। আমাদেরও আর সেই বন্দিদের এবং বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত সকল আহমদীরও যেন আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার চেতনা পূর্বের তুলনায় অধিক অর্জিত হয়, দুঃখকষ্ট ও সমস্যার কারণে আমাদের আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা হ্রাস পাবার পরিবর্তে যেন পূর্বের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পায়। নির্যাতিতদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের সকল নির্যাতিত মানুষকে অত্যাচারীদের কবল থেকে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক।

নামাযের পর আমি গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। তিনজনের গায়েবানা জানাযা রয়েছে। প্রথম স্মৃতিচারণ রেহানা বাসমা সাহেবার যিনি সৈয়্যদ সাঈদ আহমদ নাসের সাহবের স্ত্রী ছিলেন। নব্বই (৯০) বছর বয়সে সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনি ওসিয়্যত করেছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রপৌত্রী, হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব (রা.)-র পৌত্রী, হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেব (রা.)-র কন্যা এবং হযরত মীর ইসহাক সাহেব (রা.)-র দৌহিত্রী ছিলেন। বিয়ের পর তিনি স্বামীর সাথে পূর্ব আফ্রিকায় চলে যান এবং কেনিয়াতে অবস্থান করেন। সেখানেও তিনি লাজনার সেবা করেছেন, কাজ করেছেন এবং সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে সেবা প্রদান করেছেন। তার দুই পুত্র ওয়াকেফে যিন্দেগী। সৈয়্যদ তাহের আহমদ, এডিশনাল নাযের ইশায়াত আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়া এবং সৈয়দ মুজাফ্ফর আহমদ সাহেব ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে জায়েদাদ বিভাগে সেবা করছেন। তার তিনজন পুত্র; আরেক পুত্র আনিস আহমদ। তার কন্যা সুলতানা সাহেবা ডাক্তার মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের স্ত্রী, আর ফারহানা হলেন মির্যা কালীম আহমদ সাহেবের স্ত্রী, সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের পুত্রবধূ।

তার পুত্র সৈয়্যদ তাহের আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, পবিত্র কুরআনের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ও আন্তরিকতা ছিল আর অনেক বেশি ও নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন। খিলাফতের প্রতি অসীম ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। এ বিষয়টি তার সকল সন্তানই লিখেছেন। এ বিষয়টিই তিনি তার সন্তানদের মাঝে তৈরি করেছেন। তার পুত্র আনিস আহমদ লিখেছেন, আবশ্যিকভাবে প্রত্যেকের সুখ-দুঃখে অংশীদার হতেন। আর আমাদেরকে বিশেষভাবে চাঁদা প্রদানের নির্দেশ দিতেন এবং চাঁদা আদায় করেছি কি না জিজ্ঞেস করতেন। অনুরূপভাবে নফল রোযার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতেন।

তার কন্যা ফারহানা ফওজিয়া বলেন, আমি শৈশব থেকেই আম্মাকে নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতে দেখেছি। নামাযের প্রতি নিজেও যত্নবান ছিলেন এবং সময়মতো আদায়ের প্রতি সন্তানদেরকেও উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেন, (অনেক বেশি) পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার কারণে আমার আম্মার বড়ো বড়ো সূরা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আর আমাদেরকে অনেক উচ্চৈঃস্বরে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে বলতেন এবং পবিত্র কুরআন বার বার পাঠ করার কারণে, এটি গভীরভাবে অধ্যয়নের কারণে তার মাঝে এই বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়েছিল যে, আমরা দূরে বসে তিলাওয়াত করতে গিয়েও যদি কোনো ভুল

করতাম আর তিনি তিলাওয়াত শুনতে পেতেন, তবে ভুল শুধরে দিতেন। অনুরূপভাবে অনেক বেশি অতিথিপরায়ণ ছিলেন। বর্তমানে অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, কিন্তু আগে এমন সুযোগ-সুবিধা ছিল না; শীতকালে গিজার বা বয়লারের মাধ্যমে গরম পানি পাওয়া যেত না। তাই নিজেকেই সকালে উঠে পানি গরম করতে হতো, কিন্তু তবুও অতিথিদের ওযু করার জন্য গরম পানি সরবরাহ করতেন। হযরত ডাক্তার মীর ইসমাঈল সাহেব (রা.)-র পুত্র সৈয়দ সাঈদ আহমদ সাহেব মরহুমার স্বামী ছিলেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আর-রাবে (রাহে.)-র বন্ধু ছিলেন। কখনো সফরে গেলে তাদের বাড়িতে অবস্থান করতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আর-রাবে (রাহে.) স্বয়ং উল্লেখ করেন, (মরহুমা) একদম ভোরে উঠে আমার ওযুর জন্য গোসলখানায় গরম পানি রেখে দিতেন। একদিন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি তাড়াতাড়ি উঠে নিজেই পানি গরম করব যেন তার কষ্ট না হয়। তিনি (রাহে.) বলেন, আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি উঠি, কিন্তু আমি দেখলাম, এর আগেই সেখানে গরম পানি রাখা ছিল। তিনি অনেক আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হলেও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার পরিবারকে সামলেছেন।

যেভাবে আমি বলেছি, প্রথমে কেনিয়াতে ছিলেন, তারপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সালেস (রাহে.)-র নির্দেশে তারা পাকিস্তানে ফিরে আসেন। এখানে এসে (আর্থিক) অবস্থা আগের মতো ছিল না, কিন্তু তিনি অত্যন্ত হাসিমুখে এবং ধৈর্যের সাথে সবকিছু সহ্য করেছেন।

তার বোন আতিকা ফারজানা বলেন, জামা'তের জন্য তার আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রবল। জামাতের বিরুদ্ধে কোনো কথা শোনা তিনি পছন্দ করতেন না। একইভাবে তার বড়ো বোন দুররে শাহবার দোরদানা বলেন, অ্যালার্ম ছাড়াই তাহাজ্জুদে উঠে যাওয়া তার অভ্যাস ছিল। তিনি বলেন, আমি আমার পাঁচ মেয়ের কারণে দুশ্চিন্তা করতাম; তিনি আমাকে বলতেন, কোনো চিন্তা কোরো না। আল্লাহ্ তা'লা তাদের উত্তম স্থানে বিয়ের ব্যবস্থা করবেন আর আল্লাহ্ তা'লা সে অনুযায়ী উত্তম স্থানে বিয়ের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, মরহুমা অত্যন্ত ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ ও সাহসী মহিলা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো লাইবেরিয়ার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রাক্তন ন্যাশনাল সদর মোকাররমা ইফ্‌ফাত হালীম সাহেবার। তিনি লাইবেরিয়ার মনরোভিয়া ক্লিনিকের ইনচার্জ ও ওয়াকেফে যিন্দেগী ডাক্তার আব্দুল হালীম সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা করানোর জন্য হল্যান্ডে এসেছিলেন। গত ২১ ডিসেম্বর ৫৯ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তিনি এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়্যত করেছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াতে সূচনা হয়ে তার পিতামহ মোকাররম মুহাম্মদ আলী সাহেবের মাধ্যমে, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সানী (রা.)-র হাতে বয়আত করেছিলেন। ২০০৪ সনের জুলাই মাসে তিনি তার স্বামীর সাথে লাইবেরিয়াতে যান। ২১ বছর তিনি লাইবেরিয়াতে কাটিয়েছেন আর সেসময় তিনি দুই-তিন বার লাজনার সদর হিসেবেও সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। আর মৃত্যুকালেও তিনি সদর লাজনা হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছিলেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন, রোযার বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন থাকতেন, নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন, খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন আর নিজ সাংগঠনিক দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। আর্থিক কুরবানীর আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ

করতেন। অনেক বেশি সদকা ও দান করতেন। অতিথিপরায়ণ ও মিশুক ছিলেন, হাস্যবদনে থাকতেন আর হতদরিদ্র মানুষদের সেবা করার স্পৃহা তার মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অত্যন্ত পুণ্যবতী একজন নারী ছিলেন। তিনি কেবল নিজেই সাগ্রহে কুরআন তিলাওয়াত করতেন না, বরং লাজনা সদস্যাদের জন্য বিশেষ কুরআন ক্লাসের আয়োজন করাতেন। ছোটোদেরকে কুরআন পড়াতেন, এরপর তাদের আমীন অনুষ্ঠানও করাতেন। তার মাঝে অতিথিপরায়ণতার মহৎ গুণ ছিল। কেবল কয়েকদিন অতিথি আপ্যায়ন করতেন না, বরং দিনের পর দিন তার বাড়িতে অতিথিরা এসে অবস্থান করতেন আর তিনি সানন্দে অতিথি আপ্যায়ন করতেন। এমনকি রমযান মাসে তো তিনি নিয়মিত অভাবীদের জন্য সাহরী ও ইফতারীর ব্যবস্থা করতেন। প্রত্যেকে, যে-ই তাকে চিনত, তার এই মহৎ গুণের কথা অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে স্মরণ করত।

একটি হালকার প্রেসিডেন্ট আরিফা সাহেবা বলেন, নিয়মিত নামাযের বিষয়ে সচেতন তো ছিলেনই; মাঝে মাঝে তার বাড়িতে আসা-যাওয়া হতো। মরহুমা নামাযের বিষয়ে এতটা সচেতন ছিলেন যে, কোনো কাজের মাঝখানে যখন নামাযের সময় হতো তখন বলতেন, আগে নামায পড়ে নিই, এরপর বাকি কাজ করব। এটি বলতেন না যে, আগে কাজ শেষ করে নিই, এরপর নামায পড়ে নেব। আগে নামায পড়ার কথা বলতেন, পরে অবশিষ্ট কাজ করা যাবে।

একইভাবে লাইবেরিয়ার মুবাল্লিগ ফার্‌রুখ শাব্বির সাহেব লেখেন, ইফ্‌ফাত হালীম সাহেবার চরিত্রকে যদি কয়েক শব্দে বর্ণনা করতে হয় তবে ‘তিনি আহমদীয়াতের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি ছিলেন’ বলাটাই যথেষ্ট হবে। একইভাবে লাইবেরিয়ার একজন স্থানীয় ব্যক্তি মোমো কারোমা সাহেব, যিনি বর্তমানে মুবাল্লিগ হিসেবে কর্মরত, তিনি বলেন, আমার বেশ কয়েকবার মরহুমার সাথে সাক্ষাৎ করার ও তার সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল, আর প্রত্যেকবার আমার মনে হতো, আমি এমন এক মায়ের সাথে কথা বলছি, যার নিজ সন্তানের জন্য ভালোবাসার কোনো ঘাটতি নেই। তার নিজের কোনো সন্তান ছিল না। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী রয়েছেন। এছাড়া তিনি দুটি সন্তান দত্তক নিয়েছিলেন। একজন তার দেবরের মেয়ে, যাকে তিনি লালনপালন করেছেন এবং সেই মেয়েটি এখন চৌদ্দ বছরের এবং পড়াশোনা করছে। অপরজন হলো একজন লাইবেরিয়ান ছেলে, আহমদ মাসরূর সাংবা। তাকেও তিনি শৈশবেই দত্তক নেন এবং নিজের সন্তানের মতো বড়ো করেন। সে বর্তমানে ঘানার জামেয়া আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনালে ষষ্ঠ বর্ষের (দারজায়ে খামেসার) ছাত্র। আল্লাহ্ তা’লা এই সন্তানদের জন্য তার দোয়া কবুল করুন এবং তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো মিশরের মুকাররম আব্দুল আলীম আল-বারবারী সাহেবের। তিনিও সম্প্রতি ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম অত্যন্ত পুণ্যবান, নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন। তার স্ত্রী ও কন্যা আল্লাহ্‌র ফযলে আহমদী। স্ত্রী লিখেছেন, আল্লাহ্ তা’লার প্রতি আমার স্বামীর এমন গভীর ভালোবাসা ছিল যে, মনে হতো– তিনি যেন আল্লাহ্‌র যিকর করার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের মানুষ ছিলেন, কখনো কারো সম্পর্কে কটু কথা বলেন নি। তিনি বলেন, আমাদের ৩১ বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি আমাকে কখনো কোনো কষ্ট দেন নি, বরং তিনি ছিলেন একজন অতি উত্তম ও পুণ্যবান স্বামী।

তার মেয়ে ২০০৮ সালে এমটিএ আল-আরাবিয়া দেখার পর বয়আত করেছিল। তার মেয়ে শুধু নয়, বরং আব্দুল আলীম সাহেব নিজে ও তার মেয়ে উভয়েই ২০০৮ সালে এমটিএ দেখে বয়আত করেছিলেন। স্ত্রী লেখেন, আমি শুরুতে প্রবল বিরোধিতা করেছি এবং অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছি। এমনকি আমার পরিবারের সদস্যদের ডেকে এনেও বিরোধিতা করিয়েছি, কিন্তু বাবা ও মেয়ে দুইজনেই ধৈর্য ধরেছেন। একদিন তিনি নামাযের পর উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করছিলেন। স্বামীর সম্বন্ধে তিনি বলছেন যে, আমার স্বামী দোয়া করছিলেন; আমি শুনেছি, আমার বিষয়ে তিনি দোয়া করছিলেন– হে আমার প্রভু! হয় তুমি আমার স্ত্রীকে হিদায়াত দাও, না হয় তাকে আমার থেকে দূরে নিয়ে যাও। তার স্ত্রী বলেন, এই দোয়াটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করে, কিন্তু আমি তখন তাকে জানাই নি এবং নিজেও দোয়া করতে থাকি। অবশেষে এক মাস পর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে এবং বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করি। যারা বলে থাকেন যে, আমরা পথনির্দেশ পাই না– তারা জেনে রাখুন! যারা পুণ্যসংকল্প নিয়ে পথনির্দেশ লাভ করতে চায়, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তাদেরকে পথ দেখিয়ে থাকেন।

বয়আত গ্রহণের পর তার ভাইয়েরা চরম বিরোধিতা শুরু করে, কিন্তু তিনি ঈমানের ওপর অটল থাকেন। তার ভাইয়েরা একজন বিখ্যাত মৌলভীকে ডেকে আনে, যেন তাকে আহমদীয়াত থেকে বিচ্যুত করা যায়। কিন্তু সেই মৌলভী ব্যর্থ হয়। তার স্ত্রী লেখেন, কারণ আমার স্বামী তাকে নিজের পক্ষ থেকে একটিই উত্তর দেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা আমার কাছে এতটাই স্পষ্ট এবং আমার হৃদয়ে গভীরভাবে প্রোথিত যে, আমি আমার ঈমান থেকে বিচ্যুত হতে পারি না, কারণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমেই আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত মা'রেফত লাভ করেছি, যা আমি কোনোভাবেই পরিত্যাগ করতে পারি না। দেখুন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি কেমন ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন!

ইবাদতের ক্ষেত্রেও তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। তার স্ত্রী বলেন, তিনি **১১** বছর অসুস্থতার কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু সর্বদা ধৈর্যশীল ও আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি সর্বদা বলতেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করে, আল্লাহ্ তা'লাও তার সাথে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করেন।' এমনকি মৃত্যুর শেষ দিনগুলোতেও তার মুখ থেকে 'আল্লাহ্', 'আল্লাহ্' শব্দ উচ্চারিত হতো।

মিশর জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, আমি তার মাঝে জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি সর্বদা এক অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখেছি। কিছু মানুষ তাকে ফিতনায় ফেলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তিনি বয়আতের অঙ্গীকারে দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সাথে অবিচল ছিলেন। গ্রামের শত শত অআহমদীও আহমদীদের সাথে তার জানাযায় শরিক হয়েছে। তার ছেলে অআহমদী, কিন্তু তিনি তাকে এই ওসিয়্যত করে গিয়েছিলেন, আহমদীরাই আমার জানাযা পড়াবে। সে মোতাবেক প্রেসিডেন্ট সাহেব অআহমদীদের মসজিদে গিয়ে তার জানাযা পড়িয়েছেন এবং অআহমদীরাও তাতে শরিক হয়েছে। যেমনটি আমি বলেছি, ছেলে এখনো আহমদী হয় নি, কিন্তু সে অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং জামা'ত সম্পর্কে গবেষণা করছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন।

তাহের নাদীম সাহেবও তার সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি বলেন, কয়েক বছর আগে আমি যখন মিশর যাই, তখন তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি বলেন, সেখানে আব্দুল আলীম সাহেব তার স্ত্রীর বয়আতের ঘটনাটি আমাকে শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর আমার ঈমান তো শুরু থেকেই দৃঢ় ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া কবুল করে আমার স্ত্রীর বয়আতের মাধ্যমে আমার ঈমানকে আরো মজবুত করে দিয়েছেন। কারণ কেউ কল্পনাও করতে পারত না যে, একসময় যে স্ত্রী চরম বিরোধী ছিল, সে এখন আমার সাথে প্রতিটি জামা'তী অনুষ্ঠানে যায় এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে জামা'তের কাজ করে; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রান্নাবান্না থেকে শুরু করে সব কাজ যা লাজনা সদস্যারা করে থাকে– সেগুলোতে অংশ নেয়।

আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরকেও, কন্যাকে এবং স্ত্রীকেও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন, তার ছেলেকেও আহমদী হবার তৌফিক দান করুন আর তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহসুলভ আচরণ করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)